# মাথাটা বালির ওপর রাখি

মোস্তাফা জব্বার

পেশার তাগিদে প্রায় প্রতিদিনই সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে, কখনও প্রশিক্ষণ ক্লাসে, কখনও সেমিনারে বা কখনও সাধারণ অনুষ্ঠানে কথাও বলতে হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, আলোচনার কেন্দ্রটি হয়ে থাকে ডিজিটাল প্রযুক্তিবিষয়ক। আমি পর্যালোচনা করে দেখেছি, এসব স্থানে দুই ধরনের বা দুই প্রজন্মের মানুষের সাথে আমার দেখা হয়। একটি প্রজন্ম আমার বয়সী বা ৩৫-এর ওপরে যাদের বয়স তারা। এই প্রজন্মের মানুষেরাও দুইভাগে বিভক্ত। ৫০-এর ওপরের মানুষেরা পারলে প্রযুক্তি থেকে পালায়। এর নিচের বয়সের লোকজন সাধারণভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। সচরাচর মোবাইল ফোন ছাড়া অন্য সব প্রযুক্তির প্রতি এরা অনাগ্রহী। মোবাইল ফোনটাও যদি স্মার্টফোন না হয়ে ফিচার ফোন হয়, তবে এরা খুশি হন। কারণ, এরা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে জানেন না। এজন্য একদম ঠেকায় না পড়লে স্মার্টফোন এরা ধরতে চান না। আরেকটি প্রজন্ম ৩০-এর নিচের। এই প্রজন্ম দুনিয়ার সবশেষতম প্রযুক্তি ব্যবহারে উদগ্রীব হয়ে থাকে। এক ধরনের জেনারেশন গ্যাপ দুই প্রজন্মের মাঝে সুস্পষ্ট। প্রথম প্রজন্মের যারা আছেন তারা প্রায় সবাই তাদের শিশুসন্তানদেরকে মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিতে ইচ্ছুক নন। এরা শিশুদের জন্য এটি একদম নিষিদ্ধ করার পক্ষে এবং এরা কোনোভাবেই চান না যে শিশুরা গেম খেলে বড় হোক। চোখ খারাপ হওয়ার অজুহাত থেকে উচ্ছন্নে যাওয়া পর্যন্ত নানা অজুহাত আছে তাদের। ফেসবুক বন্ধ হওয়ার জন্য তরুণেরা যতই ক্ষুব্ধ হোক না কেন, অনেক অভিভাবক খুশি হয়েছেন, ছেলে-মেয়েরা বার্ষিক পরীক্ষার সময় অন্তত ফেসবুক ব্যবহার করতে পারছে না। আসলে কিন্তু বিষয়টি সত্য নয়। ফেসবুক বন্ধ হওয়ার পরের দিন থেকেই ওরা বিকল্প পথ বের করে ফেসবুক ব্যবহার করছে।

মাত্র এক বা দুই প্রজন্ম আগে যাদের পূর্বপুরুষেরা লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে সময় কাটিয়েছেন, তাদের জন্য আকস্মিকভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে উপস্থিত হওয়াতে তো এমন পরিবেশের উদ্ভব করতেই পারে। এতে তেমন দোষের কিছুও নেই। কারণ, উন্নত দেশেও প্রবীণ প্রজন্মের মানুষেরা ডিজিটাল প্রযুক্তিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাতে পারে না।

কিন্তু, আমাদের পক্ষে অন্যদের মতো হলে চলবে না। কারণ আমরা যে একটি বড় ধরনের কাজে হাত দিয়ে ফেলেছি সেটি বিবেচনায় নিতে হবে। পছন্দ হোক বা না হোক, আমরা ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছি। ২০০৯ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের ব্র্যান্ড নেমে পরিণত হয়েছে। আমরা একের পর এক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছি। আমাদের পরে ব্রিটেন ডিজিটাল ব্রিটেন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভারত ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের বিষয়গুলো শেখার অঙ্গীকার করেছে। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কেনিয়াকে বাংলাদেশ থেকে শেখার উপদেশ দিয়েছেন। মালদ্বীপ তো ডিজিটাল রূপান্তর শেখার জন্য আমাদের সাথে চুক্তিই করেছে।

ডিজিটাল রূপান্তরের গতিটা আরও বেশি হতে পারলেও আমরা একবারে কম যে এগিয়েছি সেটি নয়। ১৩ কোটি মোবাইল ফোন, সাড়ে ৫ কোটি ইন্টারনেট সংযোগ এবং ১ কোটি ৭০ লাখ ফেসবুক সংযোগ নিয়ে আমরা কি পিছিয়ে আছি? আমরা যে পিছিয়ে নেই তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, সরকার ফেসবুক বন্ধ করে রাখতে পারেনি। অফিসিয়ালি ফেসবুক গত ১৮ নভেম্বর থেকে বন্ধ থাকলেও মানুষ নানা উপায়ে সেটি ব্যবহার করছে এবং রীতিমতো ব্যবসায় বাণিজ্য করছে। সরকার যদি নিজের অবস্থান বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে ফেসবুক বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশ থাকা আর না থাকার প্রভাব সমানই হয়ে যাবে। এই ফাঁকে সরকার নতুন প্রজন্মের মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করছে, আর সরকারি দল কিছু ভোট হারাচ্ছে।

আমি বিনীতভাবে এই কথাটি বলতে পারি– ফেসবুক বন্ধ করা, বন্ধ রাখা ও সেটি অব্যাহত রাখার জন্য সরকারকে যারা পরামর্শ দিয়েছেন তারা আর যাই হোন ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের বন্ধু নন। বরং ফেসবুকের বিষয়টিই এরা স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। আমি ফেসবুকের জন্য আমাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা যদি নাও বলি, তবে সরকারের ইমেজের ক্ষতি হওয়ার বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে পারি না। এখন ফেসবুকের ইস্যুটা সম্পর্কে আমার এক ফেসবুক বন্ধু খুব ভালো মন্তব্য করেছে।

ফ্রান্সে সম্প্রতি যে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা হয়েছে তাতেও ফেসবুক বন্ধ করা হয়নি। জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষিতে সরকার ইচ্ছে করলে ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ বন্ধ করার ক্ষমতা পেলেও ফ্রান্স হামলার সময়ে ফেসবুক বন্ধ করেনি। বরং ওই সময়ে ফেসবুক সেফটি চেক নামে একটি বাড়তি সেবা চালু করে আহত-নিহতদের পরিবারকে সহায়তা করেছে। আমরা লক্ষ করেছি, ফ্রান্স সেই হামলার জন্য দায়ীদেরকে ধরার জন্য ফেসবুক বন্ধ করা নয়, মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের সহায়তা পেয়েছে।

বাংলাদেশে দুইবার ফেসবুক বন্ধ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটি বলতে পারি, জঙ্গি সন্ত্রাসীরা ফেসবুককে যেভাবে তাদের পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য ব্যবহার করে, তেমনি করে ফেসবুকেই তাদেরকে বিরুদ্ধ জনমতকেও মোকাবেলা করতে হয়। ফেসবুকে এরা হয়তো সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী রিক্রুট করার কাজটি সহজে করতে পারে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ফেসবুকে শতকরা মাত্র ৫ ভাগ অপরাধ রাজনৈতিক চরিত্রের। অন্যদিকে শতকরা ৪০ ভাগ অপরাধ নারী ও শিশু অপরাধবিষয়ক। যদি আমরা শতকরা ৫ ভাগ অপরাধের দায়ে ফেসবুক বন্ধ করি, তবে শতকরা ৪০ ভাগের জন্য কী করব?

আমি আগেও বলেছি, কোনো প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করে তার কুফল থেকে বাঁচা যায় না। বিশেষ করে প্রযুক্তিকে প্রযুক্তি দিয়েই মোকাবেলা করতে হয়। তবে ডিজিটাল প্রযুক্তি এমন যে চাইলেই সব কিছু মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না। একই সাথে প্রযুক্তিগত অপরাধ মোকাবেলায় সক্ষম জনশক্তি একান্তই থাকা দরকার। সবার ওপরে প্রয়োজন প্রযুক্তি সচেতন জনগোষ্ঠী।

আমি বালির নিচে মুখ লুকিয়ে মনে করতে চাই না যে দুনিয়া আমাকে দেখছে না। আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে আছে। যেভাবে আমরা ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ করছি, সেভাবে ডিজিটাল অপরাধ নিয়ে ভাবিনি। ফলে আমাদের আইনগত সক্ষমতার অভাব আছে। এখনও আমাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস হয়নি। এটি খসড়া আকারে টেবিলে রয়েছে। দেশের প্রচলিত শতাধিক আইনকে বদল করে ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়টিকেও নিশ্চিত করতে হবে। সেখানেও কাজের কোনো অগ্রগতি নেই। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ডিজিটাল অপরাধ দমনের যথাযথ প্রযুক্তিও নেই। যদিওবা আমরা প্রযুক্তি সংগ্রহ করতে পারি, তবে সেগুলো ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত জনশক্তিও আমাদের নেই। একইভাবে আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদেরকে সচেতন করতে পারছি না। যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করেন তারা যেমনি নিজেদেরকে ডিজিটাল অপরাধ থেকে রক্ষা করার বিষয়ে সচেতন নন, তেমনি করে অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করার বিষয়েও সচেতন নন।

আমি অবশ্যই মনে করি, যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসিজনিত একটি আকস্মিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেসবুক-ভাইবার-হোয়াটস অ্যাপ বন্ধ করাটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসহ সামাজিক-পারিবারিক-ব্যক্তিগত বা আর্থিক জীবনকে নিরাপদ রাখার জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আজকের দিনে আমরা উটপাখি হতে পারি না এবং বালির নিচে মুখ লুকিয়ে ভাবতে পারি না কেউ আমাদেরকে দেখছে না কজ

*ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com*